بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৩০ জুন, ২০২৩ মোতাবেক ৩০ এহসান, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মহানবী (সা.)-এর প্রতি হযরত সওয়াদ বিন গাযিয়্যা (রা.)'র ভালোবাসার অনন্য বহিঃপ্রকাশ সংক্রান্ত ঘটনা গত খুতবায় বর্ণনা করা হয়েছিল। তার সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এরূপ– হযরত সওয়াদ বিন গাযিয়্যা (রা.) এই যুদ্ধে বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তন করেন আর মুশরিকদের মধ্য হতে খালেদ বিন হিশাম (নামী) এক ব্যক্তিকে বন্দিও করেন। পরবর্তীতে মহানবী (সা.) তাকে খায়বারের ধন-সম্পদ একত্রিত করার জন্য আমেল বা কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। কারো কারো মতে উপরোক্ত ঘটনাটি হযরত সওয়াদ বিন গাযিয়্যা (রা.)'র পরিবর্তে হযরত সওয়াদ বিন আমরের সাথে ঘটেছিল। কিন্তু মনে হয় সেটি অন্য কোনো ঘটনা। ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থসমূহে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ঘটনা হযরত সওয়াদ বিন গাযিয়্যার নামেই বর্ণিত হয়েছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে এই ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন তা হলো,

২য় হিজরীর ১৭ই রমযান আর দিনটি ছিল শুক্রবার; খ্রিস্টাব্দ হিসেবে ১৪ই মার্চ, ৬২৩ সন। প্রত্যুষে উঠে সর্বপ্রথম নামায পড়া হয় এবং এক-অদ্বিতীয় খোদার পূজারীরা খোলা প্রান্তরে খোদার দরবারে সিজদাবনত হন। এরপর মহানবী (সা.) জিহাদ সম্পর্কে একটি খুতবা প্রদান করেন। কিছুটা আলো ফুটলে তিনি (সা.) একটি তির দিয়ে ইশারা করে মুসলমানদের সারিগুলোকে বিন্যস্ত করতে আরম্ভ করেন। সওয়াদ নামের একজন সাহাবী সারি থেকে কিছুটা সামনে এগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি (সা.) তাকে তিরের ইশারায় পেছনে সরতে বলেন, কিন্তু দৈবক্রমে তাঁর (সা.) তিরের বাঁট সেই সাহাবীর বুকে লাগে। তিনি সাহসিকতার সাথে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! খোদা আপনাকে সত্য ও ন্যায় সহকারে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু আপনি অন্যায়ভাবে আমাকে তির (দিয়ে) আঘাত করেছেন। আল্লাহ্‌র কসম! আমি এর প্রতিশোধ নিব। সাহাবীরা (রাগে) দাঁতে দাঁত চেপে ছিলেন, বিস্মিত ও উৎকণ্ঠিত ছিলেন যে, সওয়াদের হয়েছে কী? কিন্তু মহানবী (সা.) পরম স্নেহের সাথে বলেন, ঠিক আছে সওয়াদ! তুমিও আমাকে তির দিয়ে আঘাত করো। তিনি (সা.) নিজের বক্ষ থেকে কাপড় সরিয়ে দেন। সওয়াদ (রা.) ভালোবাসার আতিশয্যে এগিয়ে গিয়ে তাঁর (সা.) বক্ষে চুমু খান। মহানবী (সা.) হেসে বলেন, সওয়াদ, কী ভেবে এমনটি করলে? তিনি আবেগাপ্লুত কণ্ঠে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! শত্রু সামনে (দাঁড়িয়ে আছে), এখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারবো কিনা জানি না। (তাই) আমি চাইলাম শাহাদতের পূর্বে আপনার পবিত্র দেহের সাথে আমার দেহকে স্পর্শ করি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ের এমনই একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। (তিনি) বদরের যুদ্ধের নয় বরং মৃত্যুর সময়কার ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা

এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি (সা.) সাহাবীদের একত্রিত করেন এবং বলেন, দেখো! আমিও তোমাদের মতোই একজন মানুষ। হতে পারে তোমাদের (প্রাপ্য) অধিকার প্রদানের বিষয়ে আমার দ্বারা কোনো ভুল হয়ে গিয়ে থাকবে আর আমি তোমাদের মধ্য থেকে কারো ক্ষতি করে থাকব। আমি আল্লাহ্ তা'লার সমীপে এমনভাবে দণ্ডায়মান হবো যখন তোমরা (আমার বিরুদ্ধে) বাদী হবে– এর পরিবর্তে আমি চাই যদি তোমাদের মধ্য থেকে আমার দ্বারা কারো কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে সে এই পৃথিবীতেই আমার কাছ থেকে নিজের ক্ষতিপূরণ (আদায়) করে নিক। মহানবী (সা.)-এর প্রতি সাহাবীদের যে ভালোবাসা ছিল তার নিরিখে এটি (সহজেই) অনুমান করা যায়, তাঁর এ শব্দগুলোর মাধ্যমে তাদের হৃদয়ে কতোটা রক্তক্ষরণ হয়ে থাকবে এবং তাদের হৃদয় কতটা বিগলিত হয়ে গিয়ে থাকবে! বাস্তবেও এমনটিই হয়েছে। সাহাবীরা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তাঁদের চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকে, এমনকি তাঁদের জন্য কথা বলাও কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। কিন্তু একজন সাহাবী দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! যেহেতু আপনি বলেছেন **'আমি কারো কোনো ক্ষতি করে থাকলে সে আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নিক'–** তাই আমি আপনার কাছ থেকে একটি প্রতিশোধ নিতে চাই। মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি বলো আমার দ্বারা তোমার কী ক্ষতি হয়েছে? সেই সাহাবী বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! অমুক যুদ্ধের সময় আপনি কাতার বা সারি সোজা করছিলেন। আপনার একটি সারি অতিক্রম করে সামনে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে। আপনি যখন সারি পার হয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন আপনার কনুই আমার পিঠে লেগে যায়। আজ আমি এর প্রতিশোধ নিতে চাই। সাহাবীরা বলেন, সেসময় ক্রোধের বশে আমাদের তরবারি খাপ থেকে বাইরে বের হয়ে আসছিল আর আমাদের চোখ রক্তিম হতে থাকে। মহানবী (সা.) যদি তখন আমাদের সামনে না থাকতেন তাহলে নিশ্চয়ই আমরা তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলতাম। কিন্তু মহানবী (সা.) নিজের পিঠ তার দিকে ফিরিয়ে বলেন, তোমার প্রতিশোধ নাও এবং আমাকেও সেভাবেই কনুই দ্বারা আঘাত করো। সেই সাহাবী বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এভাবে নয়। যখন আপনার কনুই আমার দেহে লেগেছিল তখন আমার পিঠ উন্মুক্ত ছিল, কিন্তু আপনার পিঠের ওপর তো কাপড় রয়েছে! মহানবী (সা.) সাহাবীদের বলেন, আমার পিঠ থেকে কাপড় সরিয়ে দাও যেন এই ব্যক্তি আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারে। সাহাবীরা যখন মহানবী (সা.)-এর পিঠ থেকে কাপড় সরিয়ে দেন তখন সেই সাহাবী কম্পিত ঠোঁটে এবং প্রবহমান অশ্রুধারার মাঝে সামনে অগ্রসর হন এবং মহানবী (সা.)-এর উন্মুক্ত পিঠে পরম ভালোবাসায় চুমু খান আর বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! **কোথায় প্রতিশোধ আর কোথায় এই নগণ্য দাস!** হুযূরের কথায় যখন আমি বুঝতে পারলাম যে, হয়তো সেই সময় নিকটে যার কথা চিন্তা করলেও আমাদের (শরীরের) পশম দাঁড়িয়ে যায় তখন আমার ইচ্ছা হলো, আমার ঠোঁট যেন একবার এই কল্যাণমণ্ডিত দেহকে স্পর্শ করে যাঁকে খোদা তা'লা সকল কল্যাণের সমাহার বানিয়েছেন। অতএব, আমি এই বাসনা পূর্ণ করার মানসে কনুই লাগার বিষয়টিকে অজুহাত বানালাম মাত্র। আমি শেষবার আপনাকে চুমু দিতে চাইলাম। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কনুইয়ের আঘাত তো কিছুই নয়, আমাদের সবকিছুই আপনার জন্য নিবেদিত। আপনাকে

কোনোভাবে চুমু খাওয়ার সুযোগ পাওয়ার জন্য আমার হৃদয় একটি অজুহাত খুঁজছিল মাত্র! সেসব সাহাবী যাঁরা (একটু আগেই) এই ব্যক্তিকে হত্যা করতে উদ্যত ছিলেন, তার কথা শুনে অত্যন্ত রাগান্বিত ছিলেন, যখন তারা এই দৃশ্য দেখেন যে তার হৃদয়ে বিরাজ করছে ভিন্ন কিছু– তখন তারা বলেন, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের নিজের ওপর রাগ হতে থাকে যে, আমরা কেন আমাদের প্রেমাস্পদকে চুমু দেয়ার সুযোগ পেলাম না?

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ইনি ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি আমাদের হাদী ও পথপ্রদর্শক অর্থাৎ মহানবী (সা.), যিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের জন্য সেই আদর্শ রেখে গেছেন যার দৃষ্টান্ত অন্য কোনো নবীর মাঝে পাওয়া যায় না।

বদরের যুদ্ধে সাহাবীদের স্লোগান অর্থাৎ সাংকেতিক বাক্য কী ছিল– এ সম্পর্কে হযরত উরওয়া বিন যুবায়ের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যুদ্ধের দিন মুহাজিরদের সাংকেতিক বাক্য ছিল **'ইয়া বনী আব্দুর রহমান'** এবং খাযরাজ গোত্রের সাংকেতিক বাক্য ছিল **'ইয়া বনী আব্দুল্লাহ্'**, আর অওস গোত্রের সাংকেতিক বাক্য ছিল **'ইয়া বনী উবায়দুল্লাহ্'** এবং মহানবী (সা.) তাঁর অশ্বারোহীদের **'খায়লুল্লাহ্'** নাম দিয়েছিলেন। এক রেওয়ায়েত অনুসারে, সেদিন সবার সাংকেতিক বাক্য ছিল **'ইয়া মানসূরু আমিত!'** অর্থাৎ হে মনসূর, মেরে ফেলো। আরেকটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে, বদরের যুদ্ধে মদীনার আনসারের সংকেত (অর্থাৎ যেমনটি আমি বলেছি, সংকেত চিḥ বা স্লোগান) ছিল 'আহাদ, আহাদ' যা নির্ধারণ করার কারণ ছিল, রাতের আঁধারে এবং প্রবল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সময় যেন চেনা যায় যে, এরা আনসারী সাহাবী, (শত্রু নয়)। অনুরূপভাবে মুহাজির মুসলমানদের চিহ্ন ছিল **'ইয়া বনী আব্দির রহমান'**।

যুদ্ধ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর যেসব নির্দেশনা ছিল সেগুলো আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, মহানবী (সা.) সারিগুলো সোজা করার পর সাহাবীদের বলেন, আমি তোমাদের নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তোমরা আক্রমণ করবে না। যদি শত্রুরা তোমাদের কাছে এসে যায় তাহলে তির নিক্ষেপ করে তাদেরকে পেছনে ঠেলে দেবে, কেননা বেশি দূর থেকে তির নিক্ষেপ করা অধিকাংশ সময় নিষ্ফল প্রমাণিত হয় আর তির নষ্ট হতে থাকে। অনুরূপভাবে তরবারিও ততক্ষণ বের করবে না যতক্ষণ শত্রুরা একেবারেই কাছে না আসে।

মহানবী (সা.)-এর একটি খুতবার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) সাহাবীদের সামনে খুতবা প্রদান করেন, যাতে (তিনি তাঁদেরকে) জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং ধৈর্যধারণের উপদেশ দেন। তিনি (সা.) আরও বলেন, বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ্ তা'লা দুশ্চিন্তা দূর করে দেন আর দুঃখবেদনা থেকে মুক্তি দেন। এক স্থানে মহানবী (সা.)-এর একটি খুতবার বিস্তারিত বিবরণ এভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে বলেন, আমি তোমাদের সে বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করছি যার জন্য আল্লাহ্ তা'লা উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর সেই জিনিস থেকে তোমাদের বারণ করছি যা থেকে তিনি তোমাদের বারণ করেছেন। মহাসম্মানিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ্ তোমাদেরকে সত্যের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তিনি সত্যবাদিতা পছন্দ করেন। তিনি পুণ্যবানদের নিজ সন্নিধান থেকে উন্নত মর্যাদা দান করেন, এর দ্বারা তাদের স্মৃতিচারণ করা হয়, এর

মাধ্যমে তারা একে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আর আজ তোমরা সত্যের পথসমূহের মধ্য থেকে একটি পথে রয়েছ। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা তা-ই গ্রহণ করেন যা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ এমন জিনিস যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা দুশ্চিন্তা দূর করে দেন, দুঃখ থেকে মুক্তি দেন। পরকালে তোমরা এর মাধ্যমেই মুক্তি লাভ করবে, এর মাধ্যমেই মুক্তি পাবে; অর্থাৎ ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে। তোমাদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার নবী (সা.) উপস্থিত আছেন। তিনি তোমাদের সতর্ক করেন আর নির্দেশ দেন যে, আজ আল্লাহ্ তা'লার সাথে পর্দা করো পাছে তিনি তোমাদের বিষয়ে এমন কোনো জিনিস সম্পর্কে অবগত হবেন যা তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ হবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, لَمَقْتُ اللّٰهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ (সূরা আল্ মু'মিন: ১১)। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টি তোমাদের পারস্পরিক অসন্তুষ্টির বিপরীতে অধিক বড় ছিল। সেই জিনিসের প্রতি দেখো যার নির্দেশ কিতাবে তিনি তোমাদের দিয়েছেন, আর তিনি তোমাদেরকে স্বীয় নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করেছেন এবং লাঞ্ছনার পর তোমাদেরকে সম্মান দান করেছেন। খোদার আঁচল দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো যেন তিনি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। এক্ষেত্রে তোমরা নিজ প্রভুর পরীক্ষায় কৃতকার্য হও, তাহলে তোমরা তাঁর কৃপা ও ক্ষমার যোগ্য হয়ে উঠবে যার প্রতিশ্রুতি তিনি তোমাদের দিয়েছেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য। তাঁর কথা সত্য। তাঁর শাস্তি কঠোর। আমি এবং তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে আছি, যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। আমরা তাঁর কাছে স্বীয় বিজয়ের জন্য দোয়া করি, তাঁর আঁচল আঁকড়ে ধরি, তাঁরই ওপর ভরসা করি, তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ও মুসলমানদের ক্ষমা করুন। এটি ছিল তাঁর (খুতবার) বিশদ বিবরণ।

যুদ্ধের সময় কতিপয় লোককে হত্যা করতে মহানবী (সা.) নিষেধ করেছিলেন। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের দিন স্বীয় সাহাবীদের বলেছিলেন যে, আমি জানতে পেরেছি, বনু হাশেম এবং আরও কিছু লোক কুরাইশের সাথে বাধ্য হয়ে (যুদ্ধে) এসেছে, স্বেচ্ছায় আসেনি। তারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চায় না। অতএব তোমাদের মাঝে কেউ যখন বনু হাশেম গোত্রের কারো মুখোমুখি হবে সে যেন তাকে হত্যা না করে। আর যে আবুল বাখতারী'র মুখোমুখি হবে সে যেন তাকে হত্যা না করে এবং যে মহানবী (সা.)-এর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের মুখোমুখি হবে সে যেন তাকেও হত্যা না করে, কেননা এরা বাধ্য হয়ে কুরাইশের সাথে এসেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু হুযায়ফা বিন উতবা (রা.) বলেন, আমরা আমাদের পিতা, পুত্র, ভাই ও আত্মীয়স্বজনদের হত্যা করব আর আব্বাসকে ছেড়ে দেবো? আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি তাকে অর্থাৎ আব্বাসকে পাই তাহলে অবশ্যই তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করব। বর্ণনাকারী বলেন, এই সংবাদ মহানবী (সা.)-এর কানে পৌঁছলে তিনি (সা.) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে বলেন, হে আবু হাফস! হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! এদিনই মহানবী (সা.) আমাকে প্রথমবার আবু হাফস উপনামে সম্বোধন করেছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্‌র চাচাকে কি তরবারি দ্বারা আঘাত করা হবে? হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তরবারি দিয়ে তার (আবু হুযায়ফার) শিরশ্ছেদ করি! তিনি (উমর) নিবেদন করেন, আল্লাহ্‌র কসম! সে অর্থাৎ আবু

হুযায়ফা কপটতা প্রদর্শন করেছে। হযরত আবু হুযায়ফা (রা.) পরবর্তীতে বলতেন, সেদিন আমি যে কথা বলেছিলাম তার কারণে শান্তিতে ছিলাম না আর সর্বদা এ বিষয়ে ভয়ে ছিলাম, আর কেবল শাহাদতই আমার একথার প্রায়শ্চিত্ত করতে পারতো। অতএব হযরত হুযায়ফা (রা.) ইয়ামামার যুদ্ধের দিন শহীদ হন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন যে,

মহানবী (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে এটিও বলেন যে, কাফের বাহিনীতে কতক এমন মানুষও আছে যারা সানন্দে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেনি, বরং কুরাইশ নেতাদের চাপে পড়ে অংশগ্রহণ করেছে। অন্যথায় তারা হৃদয়ের দিক থেকে আমাদের বিরোধী নয়। অনুরূপভাবে কতক এমন মানুষও এই সৈন্যবাহিনীতে রয়েছে যারা মক্কায় আমাদের বিপদের সময় আমাদের সাথে ভদ্রোচিত আচরণ করেছিল এবং তাদের অনুগ্রহের প্রতিদান দেয়া আমাদের দায়িত্ব, অর্থাৎ তাদের সেই ভদ্র ব্যবহারের কারণে যা তারা মক্কায় মুসলমানদের প্রতি প্রদর্শন করেছিল। অতএব এমন কোনো ব্যক্তির ওপর যদি কোনো মুসলমান বিজয় লাভ করে তবে তাকে কোনো প্রকার কষ্ট যেন না দেয়। আর তিনি (সা.) বিশেষভাবে প্রথম শ্রেণির মাঝে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব এবং দ্বিতীয় শ্রেণিতে আবুল বাখতারী'র নাম উল্লেখ করেছেন আর তাদেরকে হত্যা করতে বারণ করেছেন; অর্থাৎ এরা মুসলমানদের কষ্ট দূর করার চেষ্টা করতো, তাই নিষেধ করেছেন। কিন্তু পরিস্থিতি কিছুটা এমন রূপ পরিগ্রহ করে যে, আবুল বাখতারী মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায় নি। যদিও মৃত্যুর পূর্বে সে একথা জেনে গিয়েছিল যে, মহানবী (সা.) তাকে হত্যা করতে বারণ করেছিলেন।

ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে যে, এরপর মহানবী (সা.) তাঁবুতে বা তাঁর জন্য যে স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল তাতে গিয়ে পুনরায় দোয়ায় নিমগ্ন হয়ে পড়েন। হযরত আবু বকর (রা.)ও তাঁর সাথে ছিলেন এবং তাঁবুর চারদিকে হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)'র নেতৃত্বে একদল আনসার প্রহরায় নিয়োজিত ছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বদরের দিন একটি বড় তাঁবুতে অবস্থান করেন এবং তিনি বলেন, اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ। অর্থাৎ, **হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমাকে তোমারই প্রতিশ্রুতি এবং তোমারই অঙ্গীকারের দোহাই দিচ্ছি। হে আমার আল্লাহ্! তুমিই যদি মুসলমানদের ধ্বংস চাও তবে আজকের পর তোমার ইবাদতকারী আর কেউ থাকবে না**। ইত্যবসরে হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর (সা.) হাত ধরে বসেন। তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! ক্ষান্ত হন। আপনি আপনার প্রভুর নিকট দোয়ায় অনেক বেশি কাকুতিমিনতি করেছেন; আর সেসময় তিনি অর্থাৎ মহানবী (সা.) বর্ম পরিহিত ছিলেন। তিনি (সা.) তাঁবু থেকে বের হন এবং তিনি (সা.) পড়ছিলেন, سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ (সূরা আল্ কমর: ৪৬-৪৭)। অর্থাৎ শীঘ্রই এরা সবাই পরাজিত হবে এবং পিঠ ফিরিয়ে পলায়ন করবে, আর এটিই সেই মুহূর্ত যে সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল এবং এটি অত্যন্ত কঠিন ও তিক্ত সময়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, বদরের দিন মহানবী (সা.) মুশরিকদের দেখেন, তারা এক হাজার এবং তাঁর সঙ্গী ছিলেন

৩১৯জন। তখন আল্লাহ্‌র নবী (সা.) কিবলামুখী হয়ে নিজের উভয় হাত প্রসারিত করে উচ্চঃস্বরে স্বীয় প্রভুকে ডেকে ডেকে বলেন, اللهمَّ أَنْجِزْ لِي ما وعَدْتَنِي. اللهم آتِ ما وعَدْتَنِي. اللهمَّ إِنْ تَهْلِكْ هذه العِصابةُ من أهْل الإسلام لا تُعْبَد في الأرض। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছো তা তুমি পূর্ণ করো। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছ তা আমাকে দান করো। হে আল্লাহ্! তুমি যদি মুসলমানদের এ দলকে ধ্বংস করে দাও তাহলে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত হবে না। কিবলামুখী হয়ে উভয় হাত প্রসারিত করে তিনি (সা.) ক্রমাগত স্বীয় প্রভুকে উচ্চঃস্বরে ডাকতে থাকেন, এমনকি তাঁর চাদরটি তাঁর কাঁধ থেকে পড়ে যায়। হযরত আবু বকর (রা) তাঁর কাছে এসে তাঁর চাদরটি তাঁর কাঁধে তুলে দেন। অতঃপর তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-কে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র নবী (সা.)! আপনার প্রভুর সমীপে আপনার মিনতি ভরা দোয়া আপনার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি অবশ্যই আপনাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন। তখন আল্লাহ্ তাঁর প্রতি এ আয়াত অবতীর্ণ করেন,

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (সূরা আল্ আনফাল: ১০)। অর্থাৎ যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে কাকুতিমিনতি করেছিলে তখন তিনি তোমার কাকুতিপূর্ণ দোয়া এই প্রতিশ্রুতির সাথে কবুল করেছিলেন যে, আমি অবশ্যই সারিবদ্ধ এক হাজার ফিরিশতা দিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করব। অতএব আল্লাহ্ ফিরিশতাদের মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করেছেন। এটি সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েত। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) তাঁর পুস্তকে এ ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,

মহানবী (সা.) তাঁবুতে গিয়ে দোয়ায় নিমগ্ন হয়ে যান। হযরত আবু বকর (রা.)ও তাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং সা'দ বিন মুআয (রা.)'র নেতৃত্বে আনসারের একটি দল ছাউনির চারপাশে পাহারায় ছিল। কিছুক্ষণ পর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একটি আওয়াজ উঠলে জানা যায়, কুরাইশ বাহিনী ঢালাও আক্রমণ শুরু করেছে। তখন মহানবী (সা.) অত্যন্ত বিগলিত চিত্তে আল্লাহ্‌র দরবারে দুহাত তুলে দোয়া করছিলেন এবং একান্ত ব্যাকুলচিত্তে বলছিলেন, اللهم إِنِّي انشدك عهدك ووعدك اللهم إن تهلك هذِهِ العِصابة مِن اهلِ الإسلامِ لا تعبد فِي الارضِ অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্! তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করো। হে আমার মালিক! মুসলমানদের এ দলটি যদি আজ এই প্রান্তরে ধ্বংস হয়ে যায় তবে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার আর কেউ থাকবে না। আর সে সময় তিনি (সা.) এত বেশি উৎকণ্ঠিত ছিলেন যে, কখনো তিনি (সা.) সিজদায় পড়ে যেতেন আবার কখনোবা দাঁড়িয়ে খোদাকে ডাকতেন, আর তাঁর চাদর কাঁধ থেকে বার বার পড়ে যেত এবং হযরত আবু বকর (রা.) তা বার বার তুলে তাঁর গায়ে জড়িয়ে দিতেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, যুদ্ধের সময় আমার মহানবী (সা.)-এর কথা মনে পড়ত, তখন আমি তাঁর তাঁবুর দিকে ছুটে যেতাম, কিন্তু যখনই আমি যেতাম তাঁকে সিজদায় পড়ে কাকুতিমিনতি করতে দেখতাম। আর আমি শুনেছি, তিনি (সা.) এ শব্দগুলি আওড়াচ্ছিলেন যে, يا حيي يا قيوم يا حيي يا قيوم অর্থাৎ হে আমার চিরঞ্জীব খোদা! হে আমার জীবনদাতা মালিক! হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর এ অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন এবং মাঝে মাঝে অবলীলায় নিবেদন করতেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার জন্য আমার পিতামাতা নিবেদিত। আপনি বিচলিত হবেন না; আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁর

প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন, আল্লাহ্ অবশ্যই স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন। কিন্তু এই ফার্সী সত্য প্রবাদ ہر کہ عارف تر است ترساں تر **(উচ্চারণ: হার কেহ্ আরেফতর আসত তারসাঁ তর)** অর্থাৎ যার যতটুকু জ্ঞান আছে সে ততটুকুই ভয় পায়– অনুসারে, মহানবী (সা.) লাগাতার দোয়া এবং কাকুতিমিনতিতে মগ্ন ছিলেন।

তাওয়াক্কুল কী– এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.) বলেন,

মহানবী (সা.) বদরের প্রান্তরে সাহাবীদের (যুদ্ধের জন্য) বিন্যস্ত করেছেন। তাঁদেরকে নিজ নিজ জায়গায় দাঁড় করিয়ে তাঁদেরকে দিকনির্দেশনামূলক উপদেশ দিয়েছেন যে, এভাবে লড়াই করতে হবে। এরপর তিনি একটি উঁচু স্থানে তাঁবুতে বসে দোয়ায় রত হয়ে যান। এমন নয় যে, তিনি সাহাবীদের মদীনায় ছেড়ে একাই সেখানে বসে দোয়ায় রত হয়েছেন, বরং প্রথমে সাহাবীদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন, এরপর তাঁদেরকে বিন্যস্ত করে নির্দেশনামূলক উপদেশ দিয়েছেন আর এরপর তিনি ছাউনিতে বসে দোয়া করতে আরম্ভ করেছেন। এটি হলো তাওয়াক্কুল বা খোদা-নির্ভরতা যা অবলম্বন করা উচিত; অর্থাৎ উপকরণও ব্যবহার করতে হবে, মানুষ নিজ চেষ্টায় যতটুকু করতে পারে তা করে তারপর দোয়ায় রত হতে হয়– এটিকে তাওয়াক্কুল বলা হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

পবিত্র কুরআনে বারবার মহানবী (সা.)-কে কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বদরের যুদ্ধ যখন আরম্ভ হয় যা ইসলামের প্রথম যুদ্ধ ছিল তখন মহানবী (সা.) আহাজারি ও দোয়া করতে আরম্ভ করে দেন এবং দোয়া করতে করতে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تُعبَد في الأرضِ أبدًا বাক্য নিঃসৃত হয়। অর্থাৎ, হে আমার খোদা! আজ যদি তুমি এই দলটিকে (যাতে কেবল তিনশ তেরজন ছিল) ধ্বংস করে দাও তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত কেউ আর তোমার ইবাদত করবে না। হযরত আবু বকর (রা.) যখন এসব শব্দ মহানবী (সা.)-এর মুখে শোনেন তখন নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি এত অস্থির হচ্ছেন কেন? আল্লাহ্ তা'লা তো আপনাকে বিজয়ের সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন। তিনি (সা.) বলেন, একথা ঠিক, কিন্তু আমার দৃষ্টি খোদার অমুখাপেক্ষিতার ওপর, অর্থাৎ খোদার কোনো প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ করতে বাধ্য নন। আল্লাহ্ তা'লা খুবই অমুখাপেক্ষী, এজন্য আমাদের উচিত সর্বদা ভীতসন্ত্রস্ত থাকা, চিন্তিত থাকা। তিনি (সা.) যখন ছাউনিতে দোয়া করছিলেন তখন তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যান। এরপর হঠাৎ জেগে উঠে বলেন, **হে আবু বকর! আনন্দিত হও, তোমাদের আল্লাহ্র সাহায্য এসে গেছে। এই দেখো! জিব্রাইল তার ঘোড়ার লাগাম ধরে সেটিকে ছুটিয়ে আসছে, তার পায়ে ধুলির চিহ্ন লেগে আছে**। এটি সীরাতে ইবনে হিশামের রেওয়ায়েত।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, হুযূর (সা.) বলেছেন, **হে আবু বকর! সুসংবাদ গ্রহণ করো, এই হলো জিব্রাঈল যে হলুদ পাগড়ি পরে আছে; সে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে নিজ ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে। সে যখন পৃথিবীতে অবতরণ করে তখন কিছুক্ষণের জন্য আমার দৃষ্টি হতে অদৃশ্য হয়ে যায় এরপর আবার প্রকাশিত হয়। তার ঘোড়ার পা ধুলিমাখা ছিল। সে বলছিল, আপনি দোয়া করেছেন তাই আল্লাহ্র সাহায্য আপনার কাছে চলে এসেছে।**

বদরের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, বদরের প্রান্তরে মহানবী (সা.) যুবায়ের বিন আওয়ামকে ডান বাহুতে নিযুক্ত করেছেন আর বাম বাহুতে মিকদাদ বিন আমরকে এবং কায়েস বিন আবী সা'সা'কে পদাতিক বাহিনীর ওপর নিযুক্ত করেছেন। পুরো সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব সার্বিকভাবে মহানবী (সা.)-এর হাতেই ছিল। মহানবী (সা.) প্রথম সারিগুলোতে ছিলেন। মহানবী (সা.) সব সাহাবীকে তাঁর নির্দেশনাধীন রেখেছেন। তিনি (সা.) বলেন, আমি আগে না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা কেউ এগোবে না। একইভাবে মহানবী (সা.) অস্ত্রের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে নসীহত করে বলেন, শত্রুরা তোমার নাগালে পৌঁছলে তোমরা তির নিক্ষেপ করবে। আর যতটা সম্ভব তির বাঁচিয়ে রাখবে। {মহানবী (সা.)-এর এই দোয়া করার সম্পূর্ণ ঘটনাটি যুদ্ধ পুরোপুরি শুরু হওয়ার পূর্বের ঘটনা। কেননা এমনভাবে লেখা হয়েছে যা থেকে মনে হয়, মহানবী (সা.) হয়তো যুদ্ধে অংশ নেননি। মহানবী (সা.) যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, কিন্তু এর পূর্বে তিনি দোয়া করেছিলেন যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লা ফিরিশতার সাহায্য প্রেরণ করেছিলেন।} যাহোক, বর্ণিত আছে, বদরের রণক্ষেত্রে কার্যত মহানবী (সা.)-এর অংশ নেয়ার বিষয়ে হযরত আলী (রা.) বলেন, আমরা বদরের দিন মহানবী (সা.)-এর পেছনে থাকতাম। তিনি (সা.) শত্রুদের সবচেয়ে কাছে ছিলেন। সেদিন মহানবী (সা.) সকল যোদ্ধার চেয়ে কঠিন যুদ্ধ করেছিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে কুরাইশ বাহিনীর আগমন ও তাদের পারস্পারিক মতানৈক্য সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, যখন কুরাইশরা বদরের প্রান্তরে আসে তখন তারা উমায়ের বিন ওয়াহাবকে মহানবী (সা.)-এর সাথে কতজন যোদ্ধা রয়েছে তা দেখার জন্য প্রেরণ করে। উমায়ের তার ঘোড়া নিয়ে মুসলমান বাহিনীর চারপাশ প্রদক্ষিণ করে এবং কুরাইশ বাহিনীর কাছে এসে বলে, আমার মনে হয় (সৈন্য সংখ্যা) তিনশ'র চেয়ে কিছুটা কম বা বেশি হবে। মুসলমান বাহিনীর সাহায্যার্থে আরো কোনো দল গুপ্তস্থানে ওঁৎ পেতে আছে কিনা তা দেখার জন্য সে পুনরায় বের হয়ে যায়। উমায়ের বিন ওয়াহাব তার ঘোড়া ছুটিয়ে অনেক দূর চলে যায় এবং সেখান থেকে ফেরত এসে বলে, মনে হয় না এদের কোনো সাহায্যকারী আছে। তবে হে কুরাইশ! আমি তোমাদের ওপর মৃত্যুর বিপদ ধেয়ে আসতে দেখছি। আমি এমন এমন উষ্ট্রী দেখেছি যেগুলোর ওপর মৃত্যুদূত বসে রয়েছে; মদীনার উট সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতদের বহন করছে। তারা এমন জাতি যাদের কাছে আত্মরক্ষার কোনো সরঞ্জাম নেই আর তাদের কাছে তরবারি ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল নেই। তারা আমাদের একেকজনকে হত্যা না করা পর্যন্ত তাদের কেউ নিহত হবে না। তারা যদি নিজেদের সংখ্যার নিরিখে আমাদের লোকদের হত্যা করে তাহলে আমাদের জীবনের আর কী-ইবা অর্থ থাকবে! এখন তোমাদের যা ঠিক মনে হয় করো। সে পর্যবেক্ষণ করে নিজের মতামত ব্যক্ত করে। হাকীম বিন হিযাম এই কথাগুলো শুনে উতবা বিন রবীয়ার কাছে এসে বলে, তুমি কুরাইশের মাঝে মর্যাদাশীল নেতা, তাই লোকদেরকে ফেরত নিয়ে চলো এবং আমর বিন হাযরামীর রক্তপণ পরিশোধ করে দাও। উতবা বলে, আমি তোমার কথায় সম্মত আছি। তুমি হানযালার পুত্র আবু জাহলের কাছে যাও। হাকীম বিন হিযাম এই উদ্দেশ্যে আবু জাহলের কাছে যায় এবং বলে, আমাকে উতবা তোমার কাছে প্রেরণ করেছে। সে রক্তপণ আদায় করে দিবে, তুমি কুরাইশদের ফেরত নিয়ে যাও। আবু জাহল বলে, উতবা মুহাম্মদকে (সা.) দেখেই ভয় পেয়ে গেছে

এবং কাপুরুষতা প্রদর্শন করছে। কক্ষনো না! খোদার কসম, আমরা ততক্ষণ ফেরত যাবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ আমাদের এবং মুহাম্মদের (সা.) মাঝে মীমাংসা করে না দেন। আবু জাহল আরো বলে, উতবা আমাদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখছে কেননা সে জানে, মুসলমানরা আমাদের কাছে উটের এক গ্রাসের সমান, অর্থাৎ অত্যন্ত সহজে আমরা তাদেরকে হত্যা করে ফেলব। আর মুসলমানদের মাঝে উতবার ছেলেও অন্তর্ভুক্ত। উতবার ছেলে মুসলমান হয়েছিল। সম্ভবত সে তার ছেলের কারণেই যুদ্ধ করতে চায় না। উতবার ছেলের নাম ছিল আবু হুযায়ফা, যিনি বদরের যুদ্ধে মুসলমান বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উতবা যখন আবু জাহলের পক্ষ থেকে কাপুরুষতার খোঁটা শুনতে পায় তখন সে বলে, এই ভীরু অর্থাৎ আবু জাহল খুব দ্রুতই জানতে পারবে, (আসলে) ভীরু ও কাপুরুষ কে?

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এই বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

উভয় বাহিনী একেবারে মুখোমুখি অবস্থানে ছিল। [পূর্বে সেনা সমাবেশ ঘটছিল আর কাফেরদের সেনাবাহিনী ছিল বৃহৎ সংখ্যায়, তখন মহানবী (সা.) দোয়ায় রত ছিলেন। সেনাবাহিনী যখন একেবারে মুখোমুখি দণ্ডায়মান হয় এবং যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার উপক্রম হয়, তখন মহানবী (সা.) যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন,] উভয় বাহিনী একেবারে মুখোমুখি অবস্থানে ছিল। কিন্তু ঐশী কুদরতের অদ্ভূত মহিমায় তখন সেনাবাহিনী এমনভাবে বিন্যস্ত ছিল যে, ইসলামী সেনাদল কুরাইশদের বাহিনীর চেয়ে অধিক বরং দ্বিগুণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল, ফলে কাফেররা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। আর অপরদিকে কুরাইশের সেনাদল মুসলমানদের দৃষ্টিতে সঠিক সংখ্যার তুলনায় কম দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল, ফলে মুসলমানদের মনোবল সুদৃঢ় হয়। কুরাইশরা যেকোনোভাবে ইসলামী সেনাদলের সঠিক সংখ্যার ধারণা লাভের চেষ্টা করছিল যেন মনোবলহারা হৃদয়গুলোতে কিছুটা সাহস যোগানো সম্ভব হয়। (যেসব হৃদয় ভীতত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যেন তাদের মনোবল বাড়ানো যায়।) এ উদ্দেশ্যে কুরাইশ নেতারা উমায়ের বিন ওয়াহাবকে প্রেরণ করে যেন সে মুসলিম সেনাবাহিনীর চতুষ্পার্শ্বে ঘোড়া ছুটিয়ে দেখে যে, প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সেনাসংখ্যা কত এবং তাদের পেছনে আরো কোনো সাহায্যকারী দল লুকিয়ে আছে কিনা? তদনুযায়ী উমায়ের ঘোড়ায় চড়ে মুসলমানদের চারপাশে একবার চক্কর দেয়, কিন্তু মুসলমানদের হাবভাবে এমন প্রতাপ, দৃঢ়সংকল্প এবং মৃত্যুর বিষয়ে এতটাই ভ্রুক্ষেপহীনতা দেখে যে, সে ভীষণ ত্রস্ত হয়ে ফিরে আসে আর কুরাইশকে উদ্দেশ্য করে বলে, আমি তাদের পেছনে কোনো গুপ্ত সাহায্যকারী দল দেখি নি ঠিকই, কিন্তু হে কুরাইশের দল! আমি দেখেছি মুসলমানদের সেনাদলে উটের হাওদাগুলো মানুষ নয় বরং মৃত্যুদূত বহন করছে, আর ইয়াসরেব (তথা মদীনার) উষ্ট্রীগুলোতে যেন সাক্ষাৎ মৃত্যু বসে আছে। একথা শোনার পর কুরাইশদের মাঝে এক ধরনের অস্থিরতা দেখা দেয়। সুরাকা যে তাদের জামিনদার হয়ে এসেছিল সে এতটাই ঘাবড়ে যায় যে, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে। আর মানুষজন যখন তাকে আটকানোর চেষ্টা করে তখন সে বলে, আমি যা দেখতে পাচ্ছি তা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। হাকীম বিন হিযাম উমায়েরের মতামত শুনে ভীতত্রস্ত হয়ে উতবা বিন রবীয়ার কাছে আসে এবং বলে, হে উতবা! তুমি তো মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছ থেকে আমর বিন হাযরামীর প্রতিশোধই নিতে চাও- তাই না! সে তোমার মিত্র ছিল। এমনটি কি হতে পারে না যে, তুমি তার পক্ষ থেকে রক্তপণ আদায় করে দিবে আর কুরাইশকে নিয়ে

ফেরত চলে যাবে? এতে সদাসর্বদা তোমার সুনাম অক্ষুণ্ন থাকবে। উতবা নিজেও ভীতত্রস্ত ছিল, তার আর কী চাই! তৎক্ষণাৎ সে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি এতে একমত। এরপর উতবা হাকীম বিন হিযামকে উদ্দেশ্য করে বলে, মুসলমান আর আমরা পরস্পর আত্মীয়ই তো। ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে আর পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করবে– এটি কি ভালো দেখায়? তুমি এক কাজ করো, এক্ষুনি আবুল হাকাম (তথা আবু জাহল)-এর কাছে যাও এবং তাকে গিয়ে এই প্রস্তাব দাও। অপরদিকে উতবা স্বয়ং উটে আরোহণ করে স্বপ্রণোদিত হয়ে লোকদেরকে বুঝাতে শুরু করে যে, আত্মীয়ের মাঝে যুদ্ধবিগ্রহ ভালো নয়। আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত আর মুহাম্মদকে (সা.) তার নিজের অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া উচিত, সে অন্যান্য আরব গোত্রগুলোর সাথে বোঝাপড়া করুক। পরিণতি যা হবে তা পরে দেখা যাবে। এছাড়া তোমরা দেখো! ঐ মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করা কোনো সহজ কাজ নয়। তোমরা আমাকে ভীরু বা কাপুরুষ যা-ই বলো আমি ভীরু নই। আমি তো এদেরকে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে দেখতে পাচ্ছি। মহানবী (সা.) দূর থেকে উতবাকে দেখে বলেন, কাফের সেনাদলের কারো মাঝে ভদ্রতা থেকে থাকলে ঐ লাল উটে আরোহিত ব্যক্তির মাঝে নিশ্চিতভাবে তা আছে। যদি এরা ঐ ব্যক্তির কথা মেনে নেয় তাহলে তাদের জন্য উত্তম হবে। হাকীম বিন হিযাম আবু জাহলের কাছে আসে এবং তার কাছে সেই প্রস্তাব দেয়। কিন্তু উম্মতের ফেরাউন কি আর এমন প্রস্তাবে সম্মত হয়! তৎক্ষণাৎ বলে, আচ্ছা, আচ্ছা! উতবা এখন নিজের সামনে আত্মীয়স্বজন দেখতে পাচ্ছে! এরপর সে আমর বিন হাযরামীর ভাই আমের হাযরামীকে ডেকে বলে, তুমি কি শুনেছ, তোমার মিত্র উতবা কী বলছে? আর তা-ও এমন মুহূর্তে যখন তোমার ভাইয়ের খুনের প্রতিশোধ নেয়ার মোক্ষম সুযোগ হাতে এসেছে। আমেরের চোখ রক্তবর্ণ ধারণ করে আর সে আরবের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী নিজের কাপড় ছিঁড়ে ও বিবস্ত্র হয়ে একথা বলে চিৎকার করতে আরম্ভ করে যে, **ওয়া আমরাহু, ওয়া আমরাহু,** হায় পরিতাপ! আমার ভাইয়ের খুনের বদলা নেয়া হচ্ছে না। হায় পরিতাপ! আমার ভাইয়ের খুনের প্রতিশোধ নেয়া হচ্ছে না। এই মরুক্রন্দন কুরাইশ বাহিনীর হৃদয়ে শত্রুতার অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করে আর যুদ্ধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে, এরপর যুদ্ধ শুরু হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক কর্তৃক অনূদিত)